ষষ্ঠ অধ্যায়

লিখনশৈলীর নতুন উদ্ভাসন : চেতনাপ্রবাহ রীতি

ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস ত্রয়ী বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নতুন আখ্যান ও সন্দর্ভ-বিন্যাসগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক সার্থক প্রয়াস, আত্মসচেতন বুদ্ধিজীবী ও মননশীল লেখক হিসেবে যাঁর পরিচয়, তিনি কখনোই পুরোনো পথটিকে অনুসরণ করতে পারেন না। ফলে আমরা পাশ্চাত্য চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রথম সার্থক প্রয়োগ তাঁর উপন্যাস ত্রয়ীর মধ্যে লক্ষ করি। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে রসকে তিনি বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নানা সমুদ্ধে অন্বিত করেছেন এবং সমকালীন সমাজের নরনারীর স্থূল ও বিকৃত অনুভবের বিষয়কে প্রধান উপজীব্য না-করে সত্যানুসন্ধান ও তথ্যানুগ বিশ্লেষণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সেজন্য উপন্যাসত্রয়ীতে কথাবস্তু (প্লট) কতটা জোরালো, এই বিবেচনা খুব বেশি পাঠককে আকর্ষণ করে না। তিনটি উপন্যাসের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রই চিন্তাশীল, বিশেষত খগেনবাবু একজন নির্জনতাপ্রিয় আত্মনিমগ্ন ভাবুক প্রকৃতির মানুষ, বিদ্যাচর্চায় তাঁর দিন অতিবাহিত হয়। তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীদেবী ভারতীয় নারীর একটি আধুনিক সংস্করণ, তবে অতিরিক্ত রকমের জেদী ও অভিমানিনী। তাঁর বন্ধু রমলাদেবীকে খগেনবাবু প্রথম প্রথম খাতির দেখাননি বলে সাবিত্রী ভীষণ অভিমান করতেন। কিন্তু পরে যখন উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালা শুরু হলো তখন তিনি ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করে বসলেন,' এখান থেকেই কাহিনীর শুরু, পরে অবশ্য স্মৃতি-রোমন্থন পদ্ধতির সাহায্যে খগেনবাবু ও সাবিত্রীদেবীর দৈনন্দিন জীবনপটের উন্মোচন করা হয়েছে। খগেনবাবুর এই একাকিত্বের অবসান ঘটান রমলাদেবী এবং এঁদের মধ্যে সূক্ষ্ম মন-দেওয়া-নেওয়া, আলো-ছায়ার সংস্করণের ছবি উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। 'অন্তঃশীলা'য় প্রতিভাত হয়েছে যে : রমলাদেবীর দেহ-সৌন্দর্যের প্রতি খগেনবাবুর তেমন কোনো জৈব আকর্ষণ নেই।

তাঁদের সম্পর্ক মূলত ব্যক্তি-অস্তিত্বগত। অস্তিত্ব-চেতনার গ্রন্থিজালের দ্বারা সমাচ্ছন্ন বলে বাইরে থেকে খুব একটা বোঝার উপায় নেই। পরিশীলিত বুদ্ধিবাদের ধর্মই হলো রক্তমাংসের কামনাকে নানা আপাতশোভন বাক্য-বিন্যাসের ফাঁদে বন্দী করে অবচেতনের স্তরে পাঠিয়ে দেওয়া - উপন্যাসত্রয়ীতে এই লিখনশৈলীই অনুসৃত হয়েছে। 'অন্তঃশীলা'র শেষে খগেনবাবু কাশীতে চলে গেছেন এবং দীর্ঘদিন অজ্ঞাতবাসে থেকেছেন। পরে উভয়ের মধ্যে চিঠি ও ডায়েরির মাধ্যমে মানবিক সেতু গড়ে উঠেছে। 'আবর্ত' পর্বে দীর্ঘ সময় ধরে খগেনবাবুর অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। সেখানে রমলা-সুজন, বিজনের উপস্থিতি প্রকট। রমলাদেবীর চিত্ত এখানে চঞ্চল, খগেনবাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁর চরিত্রে খানিকটা লঘুতা সৃষ্টি হয়েছে। আর এই কারণেই এই পর্বে উভয়ের মিলনও বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। এরপর আবার খগেনবাবুর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। 'মোহানা' পর্বে দেখা যায় তাঁর নিষ্কর্মা জীবনের অবসান ঘটানোর জন্য কাশী ছেড়ে লোকসঙ্গের পিপাসায় লখ্নৌ, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বেড়াতে যান, এবং কানপুরের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। উপন্যাসের শেষ পর্বে শ্রমিক ধর্মঘটের নেতাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেন। সরকারের রাজরোষকে তিনি পরোয়া করেন না। খগেনবাবুর জীবনের এই পরিণতি আপাত-ভাবে অবিশ্বাস্য প্রতীয়মান হয়, কেননা এতকাল তিনি যে-জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন তাতে এই পরিণতি যেন বেমানান। আসলে ধূর্জটিপ্রসাদ বোঝাতে চেয়েছেন যে মানবিক চেতনা কখনো পূর্ব-নির্ধারিত ছক মেনে চলে না। একজন বুদ্ধিজীবী ঘটনার চাপে পড়ে কর্মের আবর্তের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন। বস্তুত এখানেই তাঁর অস্তিত্বের সার্থকতা। লেখকের বিশিষ্ট রচনাশৈলী এই জীবনসত্য প্রকাশের জন্যই পরিকল্পিত; এ-বিষয়ে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করব।

সৃজনশীল সাহিত্যে রচনার সার্থকতা মূলত লিখনশৈলীর উপর নির্ভরশীল, এই শৈলীকে ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ বলেছেন 'রীতি' আর ইংরেজ সাহিত্য-বোদ্ধা বলেছেন 'style'। এই রীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি স্বতন্ত্র ধারা; এর বক্তব্য হলো : 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। অনাধুনিক - আধুনিক নির্বিশেষে সাহিত্যিকেরা এই রীতি বা লিখন শৈলী বা 'style'কে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। লেখকদের স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণ করে বলেই এর এতো মর্যাদা। এই style-র স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে L.B.Burrows বলেছেন -

> "The idea of style is essentially and immuatbly manner, the whole manner in which ideas are conceived and brought into the world as written words, manner of thinking, manner of feeling and manner of expression." [১]

অর্থাৎ স্টাইলের তিনটি দিক: বিষয়, চিন্তানুভূতি ও প্রকাশভঙ্গি। প্রথমেই বিষয়কে অবলম্বন করে অনুভূতি ও চিন্তার সাহায্যে কথাবস্তুকে রসায়িত করে নিজস্ব ভাবনার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হয়, পরে তাকে উপযুক্ত আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। সুতরাং বিষয়ের রূপও প্রকৃতির উপর রচনার বৈশিষ্ট্য বা স্টাইল অনেকটাই নির্ভর করে। অন্যদিকে বলা যেতে পারে 'style is the man' অর্থাৎ লেখকের ব্যক্তিত্ব লিখন শৈলীর মধ্যে আভাসিত হয়। প্রতিটি লেখকের ভাবাদর্শগত অবস্থান ও বিশ্ববীক্ষাই তাঁর আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা এবং অভিজ্ঞাত্য অর্জন ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশের উপায়কে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই সঙ্গে কথা-বস্তুকে নির্দিষ্ট রূপদান করে। প্রকাশরীতি অবশ্যই ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিতবহ আর সেই সূত্রে জীবনদর্শন অনুযায়ী পরিশীলিত।

বিষয়বস্তু যেমনভাবে লেখকের মনে তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি করে ঠিক সে-ভাবেই তিনি শব্দ-চয়ন ও বাক্-ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং রচনার আঙ্গিকের সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গ সুভাবের আত্মিক সম্পর্ক অনিবার্য। জীবনের জটিলতা ও কৌণিকতা যখন প্রবল, ভাষাবয়নে তত্তই দেখা যায় অন্তর্মুখিনতার প্রবণতা।

জন্মলগ্ন থেকেই উপন্যাস যেহেতু সমাজ-সচেতন শিল্প, তাই কোনো একটি পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, রচিত হয়েছে বিভিন্ন রীতি ও প্রকৃতির উপন্যাস। সমকালের সমস্যা জর্জরিত, সংক্ষুব্ধ জীবন-প্রবাহ থেকেই ঔপন্যাসিক জীবনের শিল্পরূপ দান করেন। সমকালের রাজনীতি, ধর্মনীতির দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক সমস্যা, নরনারীর বিচিত্র সম্পর্ক ইত্যাদি নানা বিষয়ের ছবি উপন্যাসে পাওয়া যায়। আবার দেখা যায় মনোবিদ্যায়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, এমনকি পদার্থ-বিদ্যায় নতুন আবিষ্কার ঘটলে তার সুদূর-প্রসারী ফল উপন্যাস ধরে রাখে। অস্তিত্ববাদ, মনোবিকলনবাদ, পরাবাস্তববাদ যেমন উপন্যাসে বারবার নতুন-মাত্রা যোগ করেছে, তেমনি মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের বিস্তার থেকে মানবসত্তার নতুন পরিচয় সন্ধান শুরু হয়েছে। লেখক ও পাঠকের সম্পর্কে ঘটে গেছে পালাবদল। ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্তিত্বের টানাপোড়েন যখন থেকে শুরু হয়েছে, মূল্যবোধের ধ্যানধারণাও আমূল পালটে গেছে। সমগ্রতার বদলে খণ্ড-জীবনই ক্রমশ ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশেষত উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে ঔপন্যাসিকগণ চরিত্র সৃষ্টিতে ও আখ্যান-বয়নে মনস্তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিশশতকের উপন্যাসে যে শূন্যতাবোধ বা মৃত্যু-চেতনা প্রাধান্য পেয়েছে, তার পেছনে রয়েছে নতুন উপলব্ধিজাত চিন্তার অনুরণন। এই মৃত্যু-চেতনা বা নেতিবোধ সর্বদাই আধুনিক মানুষকে কুঁড়ে-কুঁড়ে খায়, নিজেরই কাছে মানুষ হয়ে ওঠে বহিরাগত। ফলে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও প্রতিকারহীন বিষণ্ণতা প্রতিভাত হয় মৌল মানবিক সুভাব হিসেবে। আধুনিক কবি জীবনকে দেখতে পান ক্লেদজ কুসুম বলে, জীবনযাপন হয়ে ওঠে নরকে ধাতু-উদ্‌যাপন। 'angst' বা উদ্বেগ আর 'ennui' বা অবসাদ বিবেচিত

হয় মানবজীবনের অনিবার্য নিয়তি হিসেবে। ফ্রান্‌ৎস্‌ কাফকা জানান, 'we are the nihilistic figments, all of us'। বিশশতকের বাংলা উপন্যাসেও মর্যদাহ জীবনসত্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে; সত্য-শিব-সুন্দরের চিরাগত আদর্শ প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সৃজনশীল তরুণমন নতুন পথ, নতুন কথাবস্তু, নতুন প্রকরণ, নতুন লিখনশৈলীর সন্ধান করেছে।

ধূর্জটিপ্রসাদের রচনাশৈলীর অভিনবত্বকে এই প্রেক্ষিতেই বিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর স্বাতন্ত্র্য আসলে নতুন জীবনাদর্শ-প্রসূত; স্বভাবত লিখনশৈলী এই নতুনত্বের ধারক ও বাহক। এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁর রচনার প্রধান সৌন্দর্য এবং সাহিত্যিক মর্যাদার ভিত্তি। তাঁর রচনাশৈলীকে কেউ কেউ অপরিচয়ের দূরত্ববশত কৃত্রিম বলে অনুমান করেছেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কেননা যা গতানুগতিক নয় তাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাঁর বিষয়বস্তু নতুন বলেই তাঁর স্টাইলের মধ্যে নতুন দ্যোতনা ফুটে উঠেছে। একটু সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে যদি বিচার করা যায় তাহলে তাঁর স্টাইলকে অনবদ্য বলে স্বীকার করে নিতেই হয়। সর্বোপরি ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন আধুনিকতার উৎকেন্দ্রিক অভিব্যক্তির পরিপন্থী। গতানুগতিক ধারায় কোনো কিছুকে বিচার করতে তিনি চান নি। ফলে বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। ধূর্জটিপ্রসাদের এই মানসিক প্রবণতাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই তাঁর শৈলীর স্বরূপকে মূল্যায়ন করা যাবে।

ধূর্জটিপ্রসাদের বিভিন্ন রচনা থেকে জানা যায় যে তাঁর মনের প্রবণতা ছিলো বিভিন্নমুখী। নানাধরণের বিষয় তাঁর সৃষ্টি-কর্মকে সমৃদ্ধ করেছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, শিক্ষা, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ ইত্যাদি কোনো দিকেই তাঁর আগ্রহের অভাব লক্ষ করা যায় নি। ১৯১০ সালের কাছাকাছি পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো তার ফলে উপন্যাস সাহিত্যে আমরা এক নতুন পথটির সূত্রপাত হতে

দেখলায় - এরই নাম চেতনাপ্রবাহ রীতি। বাংলা সাহিত্যে এই ধারার প্রথম সচেতন শিল্পী হলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বুদ্ধিবাদী এই ঔপন্যাসিক - একই অবিচ্ছিন্ন কাহিনীস্রোত ও পাত্রপাত্রী অবলম্বন করে যে ত্রয়ী উপন্যাস 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহানা' রচনা করেছেন তাতে নায়কের অন্তর্মুখী চেতনার প্রকাশ, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে চেতনার প্রবহমানতা বেশ স্পষ্ট ভাবেই অনুভব করা যায়।

খগেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর আত্মহত্যা এবং তার শবদাহের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের শুরু। খগেনবাবু চিতার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনি স্থির, কিন্তু তাঁর মনে জটিল চিন্তার বুনট। তিনি দেখছেন,

> " - কাঠ ক্রমে ধরে উঠল, প্রথমে ধীরে ধীরে, খানিক পরে জোরে অতি শীঘ্র দাউ দাউ করে। মাথায় একরাশ চুল গেল পুড়ে, কী দুর্গন্ধ যেন উনুনে ফেন পড়েছে। সাবিত্রী একবার রাঁধতে গিয়ে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে। তখন তার চুল আধখানা বাঁধা ছিল। তাই দেখে খগেনবাবু বলেছিলেন - যে রাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না। সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দেয় - এখান থেকে চলে যাও। চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে ... প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে, পুট পুট করে শব্দ হতে লাগল। গা ফেটে জল বেরুচ্ছে।" [২]

'চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে' - এই কথার উপর ভিত্তি করে লেখক অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে আসেন - এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে চেতনাপ্রবাহ-মূলক। এই পদ্ধতিই ধূর্জটি প্রসাদের ত্রয়ী উপন্যাসের শিল্পরূপকে ধারণ করেছে। এই পদ্ধতি প্রণয়নের জন্যই ধূর্জটিপ্রসাদ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন।

চেতনাপ্রবাহ-রীতি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের রচনাকৌশলগত বৈশিষ্ট্যেরই উন্নততর পর্যায়। ব্যক্তিজীবন ও ব্যক্তিত্বের প্রবাহ-মানতার ভিত্তিতেই চেতনাপ্রবাহ রীতির সৌধ গড়ে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে স্মৃতি ও বাসনার সমন্বয়ে পুরোপুরি এক নতুন ধাঁচের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সূত্রপাত হয়েছে। মানুষের অবচেতন স্তর জীবনের গতিকে অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের আপাত-বিশৃঙ্খল আচরণ এবং আপাত-অসংলগ্ন গতিকে চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করে। এটিই এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। জীবনের বাইরের রূপ-বর্ণনার মধ্য দিয়েই উপন্যাসের সার্থকতা নির্ভর করে না, তাঁর অন্তরের রূপ পরিচিতি-ও আমাদের জানা দরকার। মানব-জীবনের অন্তরের মধ্যেও উপন্যাসের অজস্র উপকরণ সঞ্চিত থাকে - এই বোধ থেকেই জন্ম নিয়েছে চেতনাপ্রবাহ রীতি। এই রীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো - স্বগত কথন, অনুচ্চারিত আত্মকথন, তির্যক্ বাক্-বিন্যাস এবং অনুচ্চ বচন-প্রবৃত্তি।

জীবনের সামগ্রিক পরিচয় আমরা উপন্যাসের মধ্যে পেতে চাই। আবার জীবনের কোনো বাঁধা-ধরা-ছক থাকতে পারে না, ফলে উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনও বিচিত্র সমস্যাময়, দ্বন্দ্বময় এবং আবেগময়। স্বভাবতই এই শ্রেণীর উপন্যাসের শিল্পরূপের কোনো সুনির্দিষ্ট ছক পাঠক প্রত্যাশা করতে পারে না।

কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসত্রয়ীতে অভিব্যক্ত নতুন লিখনশৈলী সম্পর্কে আলোচনার আগে দেখা প্রয়োজন, ১৯১০ সালের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কেন এবং এর তাৎপর্যই বা কী ? কৃতবিদ্য ধূর্জটিপ্রসাদ ইউরোপের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে পারঙ্গম ছিলেন,[৩] এবং নানা তরঙ্গভঙ্গ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট ধারণা ছিলো। আমরা জানি বিশ শতকের প্রথম দশকেই ফ্রয়েডের যুগান্তকারী তত্ত্ব-প্রস্তাবনা মানবচেতনা সম্পর্কে চিরাগত ধারণাকে আমূল আলোড়িত করেছিলো। এর ফলে দ্রুত-পরম্পরায় চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে জন্ম নিতে লাগলো নতুন নতুন নান্দনিক ভাবাদর্শ। ১৯২৪ সালের মে মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ছাত্র-সভায় ভার্জিনিয়া উল্‌ফ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন -

"And now. I will hazard a second assertion which is more disputable parhaps, to effect that on or about december, 1910 human character changed".[৩]

স্বভাবতই একটি প্রশ্ন জাগে, তাহলো, ১৯১০ সালে এমন কী ঘটলো, যার ফলে 'মানব চরিত্র বদলে গেলো'। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝা না গেলেও, বিষয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করলে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে লন্ডনে একটি চিত্র-প্রদর্শনী হয়, তাতে ভ্যান্‌গখ, পল্‌গগ্যাঁ, অঁরি ম্যাতিশ, পাবলো পিকাসো এবং পলসেজান্ - প্রভৃতির কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চিত্র প্রদর্শিত হয়। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এই চিত্র প্রদর্শনীকে মনে রেখেই মানবচরিত্র পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। ১৯১০-এর পরবর্তী সময়ে ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ করে উপন্যাসে - এক নতুন যুগের উদ্ভব হয়েছিলো। অপরদিকে তথা-কথিত বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকদের যেমন বেনেট, ওয়েলস্, গলসওয়ার্দি প্রভৃতি সাহিত্যাদর্শের উপযোগিতা সম্পর্কে দ্বিধা ও সংশয় দেখা দেয়। এরই প্রতিক্রিয়ায় দেখা দেয় এক নতুন রচনাশৈলী। ১৯১৩ সালে ফরাসী ভাষায় মার্সেল প্রুস্তের 'হারানো সময়ের সন্ধান' নামক ষোল খন্ডে সম্পূর্ণ বৃহৎ উপন্যাসের প্রথম দুটি খন্ড প্রকাশিত হয়। শেষখন্ডটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯২৭ সালে। ১৯১৫ সালে ইংল্যান্ডে ডরোথি রিচার্ডসন তাঁর বৃহৎ উপন্যাস 'পিলগ্রিমেজ'-এর প্রথম খন্ড 'Pointed Roofs ' প্রকাশ করেন। তার একবছর পরে ১৯১৬ সালে জেমস জয়েস তাঁর 'A Portrait of the Artist as a young man ' উপন্যাসটি প্রকাশ করেন। এই তিনটি উপন্যাস ইউরোপীয় কথাসাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করলো।

১৯১৪ সালে 'The Times Literary Supplement' নামক সাহিত্য-পত্রিকায় হেনরি জেম্‌স ঔপন্যাসিকের শিল্পাদর্শ ও রচনারীতি সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তোলেন। এটি ধারাবাহিকভাবে 'The younger generation' শিরোনামে দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ দুটিতে জেম্‌স্, ওয়েল্‌স্, গল্‌স্-ওয়ার্দি, বেনেট প্রভৃতি বিখ্যাত বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁর মতে -

(ক) এই সব বাস্তববাদীরা উপন্যাসে মানবজীবনের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁরা সম্পূর্ণ জীবনকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন না। (খ) এই সব বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকেরা বাইরে থেকে মানুষের চরিত্র আঁকেন। স্বভাবতই তাঁরা জীবনকে খন্ডিত করেই চিত্রিত করেন। মানব-চেতনার মধ্যে যে চিরন্তন আলো-আঁধারের খেলা চলছে, যে সূক্ষ্ম অনুভূতির লীলা-চাঞ্চল্যে মানবচেতনা চিরমুখর - তার কোনো পরিচয়ই তাঁরা দিতে পারেননি। অর্থাৎ মানব-জীবনের বাইরের খোলসটাকে নিয়েই তাঁরা জীবনচিত্র অঙ্কন করেন। কিন্তু বহিরাবরণ ভেদ করে অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারেন না।

তাহলে হেনরি জেমস্ ইংরেজি উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ অর্থাৎ stream of consciousness কলাবিধির প্রথম সচেতন শিল্পী। তিনি সর্বপ্রথম এই নতুন কলা-বিধির সপক্ষে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকে বাইরের জগৎ থেকে অন্তরমুখী করে তোলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৯১০ সালকে নিয়ে পাশ্চাত্যদেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তারই প্রভাবে উপন্যাস-সাহিত্যে যে নতুন রচনাশৈলীর উদ্ভব হয়েছিলো তার নামকরণ করা হলো stream of consciousness পদ্ধতি। বাংলা ভাষায় এই পদ্ধতিকে আমরা 'চেতনাপ্রবাহরীতি' নামে চিহ্নিত করেছি। The stream of consciousness কথাটি প্রথম উত্থাপন করেন দার্শনিক উইলিয়াম জেমস্ ১৮৮৪ সালে। The Principles of Psychology - নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন -

> "Consciousness, then, does not appear to itself chopped up in bits. Such words as 'chain or train' do not describe fitly as it presents itself in its first instance. It is nothing joined, it flows. A 'river' or a 'stream' are the metaphors by which it is most naturally described. In talking of it, let us call it the stream of thought, of consciousness, or of subjective life."[8]

১৯১৮ সালে ইংরেজ লেখিকা যে সিন্‌ক্লেয়ার ডরোথি রিচার্ডসনের 'Pointed Roofs' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁর রচনাপ্রকরণকে 'Stream of consciousness' বা 'চেতনাপ্রবাহ' নামে চিহ্নিত করেন। এ-পদ্ধতির প্রচলন আমরা অনেক আগেকার উপন্যাসের মধ্যেও দেখতে পাই। যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর স্টার্ণ, ফিল্ডিং, রিচার্ডসন, জেন্ অস্টেন ইত্যাদি অনেক ঔপন্যাসিকদের রচনায় এই পদ্ধতির কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ করি। রিচার্ডসন চিঠিপত্রের আকারে লেখা 'ক্লারিসা হার্লো' নামক বৃহৎ উপন্যাসে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন ...

> "These letters ... abound not only with critical situation, but with what may be called instantaneous description and reflections, as also with affecting conversations; many of them written in the dialogue or dramatic way".[৫]

এখানে উল্লিখিত 'Instantaneous' এবং 'reflections' এই শব্দ-দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। চেতনাপ্রবাহ রীতিতে এরাই উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়; কয়েকটি কাহিনীর সমন্বয়ে রচিত তাঁর পত্রাকার উপন্যাসে কয়েকটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অবশ্য রিচার্ডসন এই উপন্যাসে আরও কয়েকটি কৌশল ব্যবহার করেছেন যা ইংরেজিতে 'mental Prattle' নামে অভিহিত। রিচার্ডসনের 'ক্লারিসা হার্লো' উপন্যাস থেকে এই কৌশলের দৃষ্টান্ত আহরণ করা যায়।

পরবর্তী যুগে অবশ্য এর আরো ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। জেন অস্টেনের উপন্যাসেও আমরা চেতনাপ্রবাহরীতির পূর্বাভাস খুঁজে পাই। 'এম্‌মা' নামক উপন্যাসে কয়েকটি বিশেষ রচনা-কৌশলের প্রয়োগ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ উপন্যাসে মিস্ বেটস্ নামক একটি প্রগলভা বৃদ্ধার কথাবার্তায় ও আচরণে এই প্রয়োগের উদাহরণ পাই। যেমন 'এম্‌মা'

উপন্যাসে মিস বেট্‌স্‌ এর সংলাপ বা এমমার আত্মকথন কিংবা হ্যারিয়েট-এর অন্য চরিত্র উদ্‌ঘাটনে আমরা চেতনাপ্রবাহরীতির কিছু পূর্বাভাস লক্ষ করি। কিন্তু রিচার্ডসন বা জেন অস্টেন-এর উপন্যাসগুলি পুরোপুরি চেতনাপ্রবাহরীতি অনুসরণ করেনি। কেননা তির্যক বাক্‌বিন্যাস বা বক্রোক্তি, অনুচ্চ বচঃপ্রবৃত্তি, স্বগতোক্তি, অনুচ্চারিত আত্মকথন ইত্যাদি লক্ষণ কিছু যান্ত্রিক কৃৎ-কৌশল নয়; মানব চৈতন্যের মৌলিক পরিবর্তনের সূত্রেই এদের উদ্‌ভাবন ও প্রয়োগ। সুতরাং, ১৯১০ সালের পূর্ববর্তী উপন্যাসে আমরা যদিও বা এধরণের প্রকরণের কিছু আভাস পাই, উপন্যাসিকের বিশ্ববীক্ষা ও ভাবাদর্শগত অবস্থানে নিহিত মৌলিক ভিন্নতার ফলেই পূর্বসূরীদের রচনায় 'চেতনা-প্রবাহ রীতি'র পুরোপুরি অনুসৃতি সম্ভব নয়। এছাড়া স্যামুয়েল বাট্‌লরের নামও আমরা করতে পারি। কেননা, তাঁর 'The way of All Flesh'-নামক উপন্যাসে উনত্রিশটি অধ্যায়ে পিতা, মাতা ও পুত্রের অনুচ্চারিত আত্মকথনের মধ্য দিয়ে তিনি এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন। সম্ভবত আরো কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসিকের নামও আমরা করতে পারি যাঁদের রচনায় কখনো এই নব্যরীতির পূর্বগামী ছায়া অনুভূত হয়। যেমন : লিও টলস্টয় এবং ফিয়োডোর ডস্টয়েভস্কি। তাঁদের রচনাপদ্ধতিকে কেউ কেউ 'search light' বা 'আলোক-সম্পাত' বলে বর্ণনা করেছেন। এই আলোক-সম্পাত কখনো বা করা হয় কোনো একটি বা একাধিক চরিত্রের উপর, কখনো বা বিশেষ মানসিক অবস্থা বা mood -এর উপর, আবার কখনো কোনো একটি ঘটনার উপর। এঁরা দুজনই অসাধারণ লেখক। এমনই এঁদের রচনা-কৌশল যে ধারাবাহিকতাকে অক্ষুন্ন রেখেও বিভিন্ন চরিত্রের অন্তরের অন্তঃস্থলের মধ্যে তাঁরা পাঠকের দৃষ্টিকে সঞ্চালিত করতে সক্ষম। পাঠক-হৃদয় ও উপন্যাসে চিত্রিত ব্যক্তিদের হৃদয়ের মধ্যে একটা বোঝা-পড়া বা হৃদয়তার সেতু গড়ে ওঠে। প্রাক্‌-ফ্রয়েডীয় যুগে তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন যে মানুষের কর্মজগতের জাগ্রত সত্তায় যে বিচার-বুদ্ধি আছে যার গতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নয়। আমাদের প্রকাশ্য জীবনে যা ঘটে তা বাস্তব এবং সত্য; কিন্তু এই বাস্তব ও সত্যের রূপ ঔপন্যাসিক যতই যুক্তিসঙ্গত ও যথাযথভাবে বর্ণনা করুন না কেন তাতে মানব জীবনের সকল কথা বলা হয় না। মানব-মনের চিরন্তন কুহেলিকা

তাই বহুলাংশে সাহিত্যিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। মানুষের মন যদি বিচিত্র মার্গে লীলাচঞ্চল হয় তাহলে ঔপন্যাসিক সাধারণভাবে সেই মনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে লোক-দেখানো বা মন-ভোলানো কাহিনী সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সে কাহিনী সৃষ্টি সার্থক জীবন-শিল্প হতে পারে না। অতএব মানব-মনের বাধা বন্ধনহীন, অযৌক্তিক এমনকি অস্বাভাবিক গতি ও প্রকৃতির পরিচয় দিতে গেলে ঔপন্যাসিককে বাধ্য হয়ে চেতনা-প্রবাহ পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে হয়।

টলস্টয়ের 'আন্না-কারেনিনা' উপন্যাসটির শেষ পর্বে যেখানে আন্না আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে-অবস্থার বর্ণনায় টলস্টয় যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অসামান্য মহানুভূতিশীল সংবেদনার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। অন্যদিকে ডস্টয়েভস্কির 'ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসে রাসকোলনিকোফ্ চরিত্রের মধ্য দিয়ে চেতনাপ্রবাহ রীতির সুস্পষ্ট প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। অনেক সমালোচক একে খাঁটি চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতি বলেও স্বীকার করেছেন। এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই যে রাসকোলনিকোফের দ্বন্দ্বমথিত মনের মধ্যে যে-সব বিচিত্র ভাবতরঙ্গের উদয় হচ্ছে তারই যথাযথ ভাষাচিত্র উপস্থাপনার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। এই বর্ণনায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোনো ভাবই বাদ পড়েনি। এই উপন্যাসে যেন ডস্টয়েভস্কি আত্মতা (**Subjectivity**) ও বস্তুতা (**objectivity**)-এর পুরোনো দ্বৈততাকে অতিক্রম করতে পেরেছেন। এটা চেতনা-প্রবাহের লক্ষণাক্রান্ত, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই সূত্র ধরে কেউ কেউ শেক্স-পীয়ারের শ্রেষ্ঠ চারটি ট্র্যাজেডিতে (হ্যামলেট, ম্যাক্‌বেথ, ওথেলো, কিংলীয়ার), বিশেষভাবে স্বগতোক্তিগুলিতে চেতনাপ্রবাহরীতির পূর্বাভাস লক্ষ করেছেন। কিন্তু এই নিয়ে তর্কের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে যেহেতু আধুনিক জীবনযন্ত্রণাক্লিষ্ট বিশেষ যুগবাহিত অভিজ্ঞতার ফলেই বাস্তব হয়ে উঠেছিলো অনির্ভরযোগ্য এবং সচেতন জগৎ অবভাসে লীন। তাই অধিবাস্তবতার তাৎপর্য এবং সত্যভ্রম থেকে সত্যে পৌঁছানোর পথ সন্ধানের উপায় হিসেবে উদ্ভূত হয়েছিলো - চেতনাপ্রবাহরীতি। সময়-লালিত ও সময়-স্পন্দিত এই রীতিকে সময়-পরিধির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত

ভাবা যায় না। তবে সাহিত্যে কোনো কিছুই আকস্মিক নয়, নান্দনিক ক্ষেত্রে সত্যিই 'রাতের সমস্ত তারা থাকে দিনের আলোর গভীরে'। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে চার্লস্ ডিকেন্স-এর 'পিক্উইক পেপার্স' - নামক বিখ্যাত রচনায় Mr. Jingle -এর কথাবার্তায় আমরা এই পদ্ধতির আভাস পেতে পারি। কেউ কেউ বলেন জেম্স্ জয়েস্ তাঁর পৃথিবী-বিখ্যাত 'Ulysses'-উপন্যাসের নায়ক মিঃ ব্লুম্-এর চরিত্র পরিকল্পনা করতে গিয়ে ডিকেন্স দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

মোট কথা, ১৯১০-এর পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য কথা-সাহিত্যে কিছু কিছু পূর্বাভাস থাকলেও আমাদের উদ্দিষ্ট চৈতন্যপ্রবাহরীতি বিশশতকের জটিল জীবন-ভাবনার বিশেষ অভিব্যক্তি। প্রচলিত ধারার উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীরা যেভাবে ব্যবহার করে বা নিজেদের মধ্যে কথা বলে - একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, এরা আসলে লেখক দ্বারা আরোপিত পূর্বধার্য ছাঁচ অনুযায়ী আচরণ করে। সুতরাং এতে সেই সব পাত্রপাত্রীর স্বভাব বা ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হবার পরিবর্তে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে; কার্যত উপন্যাস জুড়ে থাকে কৃত্রিমতা। বাস্তব জীবনে মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে কার্যকারণ সূত্র অনুযায়ী পরিচালিত হয় না; আচার-আচরণে বা কথাবার্তায় সংলগ্নতার পরিবর্তে অসংলগ্নতা, বাঁধা-ধরা ছাঁচের পরিবর্তে সংগতিবিহীন ব্যবহার, ধারাবাহিক চিন্তার পরিবর্তে অসংবদ্ধ ও আকস্মিক ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একই মানুষ ভিন্ন-ভিন্ন মুহূর্তে এমন অসামাঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করে যে মানবস্বভাবকে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ শৃঙ্খলার অধীন বলে ভাবা যায় না। তাই বিশশতকের উপন্যাস নিটোল কাহিনীবৃত্ত বা পূর্বনির্ধারিত অর্থপরম্পরা অন্বেষণ না করে কৃত্রিম রচনারীতির বদলে স্বাভাবিকতার পথে যাত্রা করে। বাস্তবতার দোহাই দিয়ে যে কৃত্রিম রম্যতা সাহিত্যকে মিথ্যার বেসাতি করে তুলেছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই চৈতন্যপ্রবাহরীতির উদ্ভাবন করা হয়েছে। উপন্যাসে চিত্রিত ব্যক্তি-বর্গকে বৃত্তবন্দি না করে মনন-জীবিতার আধারে স্থাপন করা হয়েছে। স্বভাবতই এই নতুন রীতির উপন্যাসে আখ্যানের বয়ন এবং ভাষা-প্রয়োগ সম্পূর্ণ পৃথক।

জেম্‌স জয়েসের 'Ulysses' উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক এ্যান্টনি বার্গেস মন্তব্য করেছেন -

> "The existing techniques for expressing thought and feeling were insufficient. Hence the 'Stream of consciousness' or 'interior monologue' - an endless commentary from the main characters on the data thrown at them by life, always unspoken, sometimes chaotic, following subterranean laws of association rather than logic. The device had been used before - by Dickens, Samuel Butler, even Jane Austen but never on the scale or to the limits employed by Joyce. After all, he lived in the psycho - analytic era, through he considered he had nothing to learn from either Freud or Jung."[৬]

জয়েসের রচনাশৈলী সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা যেতে পারে যে তাঁর উপন্যাস-বীক্ষায় স্মৃতির স্থানই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানিয়েছিলেন, 'কল্পনা কিছুই নয়, শুধুমাত্র স্মৃতির বিষয়কে অনুশীলন করা'। ('Imagination is nothing but the working over of what is remmembed')[৭] 'ulysses' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র স্টিফেন জানিয়েছিলো যে শিল্প আসলে পরিচিত অতীত ও বর্তমানকে অপরিচিত ভবিষ্যতের দর্পণে প্রতিফলিত করে দেখায় -

> "In the intense instant of imagination, when the mind, Shelley Says, is a fading coal, that which I is that which I am and that which in possibility I may come to be".[৭]

জয়েসের ভাষা-ব্যবহারও চেতনাপ্রবাহকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরঙ্গ সহ ধারণ করার প্রয়োজনে পুরোপুরি অভিনব হয়ে উঠেছে। এ-সম্পর্কে সমালোচক রিচার্ড এল্‌মেন মন্তব্য করেছেন যে

ভাষার মধ্য দিয়ে আসলে তিনি মন ও দেহের গোপন জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন কেননা অন্য কোনো শিল্প-মাধ্যমে জগতের এত ব্যাপক পুনর্মূল্যায়ন সম্ভব নয় -

"Only through language could he express fully the secret life of the mind, and the secret life of the body. Music and the other arts might provide anodyne or stimulus or perception, but could not accomplish the revaluation of the world. Language, On the other hand, working with the full resources of that world, might join things read and thought and heard of with things actually encountered. Details accumulate and, in the process of shouldering each other aside or fusing with one another, gradually change their nature." [৮]

চৈতন্যপ্রবাহরীতির সম্ভাবনাকে জয়েস তাঁর 'Finnegans' wake' উপন্যাসে এমন একটি মাত্রায় অন্বিত করেছেন যে আখ্যান-বয়নের উপযোগী ভাষা-কাঠামোর বদলে সমালোচক কথিত - 'dream texture' বা স্বপ্নময় পাঠকৃতির উপযুক্ত সৃষ্টির এক-বাচনিকতাকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছে। অর্থাৎ ভাষার আত্মতা এই উপন্যাসে বস্তুবিশ্বকে এমনভাবে দূরে সরিয়ে দিয়েছে যে বহু পাঠকই বিহ্বল বোধ করেন। কোনো কোনো সমালোচক একে জয়েসের স্বেচ্ছা-নির্বাসন বলে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। এ্যান্টনি বার্গেস এই সূচিন্তিত মন্তব্য করেছেন যে -

"Finnegans' wake, despite the libraries of exegesis that have been erected, remains literally a closed book to

the majority of serious readers of literature .... The world of sleep is a legitimate subject matter for the novelist, but perhaps no verbal technique for expressing it could ever be wholly satisfactory. To use ordinary language would be to falsify, tacitly to interpret, not to present an objective image of the quality of the dreaming experience. Extraordinary language of any kind always causes murmurs, but the honest artist, committed to using it, must brave them"[১]

চেতনাপ্রবাহরীতির অন্যতম পুরোধা লেখকও তাত্ত্বিক ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উপন্যাস সম্পর্কে এ্যলেন য্যাক লাউস্কিন লিখেছেন -

"Virginia Woolf often tries to indicate the boundaries of language. An awareness of the gap between words and what they represent stems from the realisation that languages does not copy a given reality. Words can jingle together quite regardless of meaning, and out of context they lose their transparency and seem strangely opaque."[১০]

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'মিসেস্ ড্যালোওয়ে' চৈতন্য-প্রবাহ রীতির প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা-গুলির অন্যতম। অনেক সমালোচকই তাঁর উপন্যাসের মধ্যে চিত্রকলার সুগভীর প্রভাব লক্ষ করেছেন। বিশেষত স্থানীয় আয়তন বা 'space' উপস্থাপনার ইম্প্রেশনবাদী চিত্রকলার

ক্ষেত্রে উল্‌ফের রচনাশৈলীর নিবিড় আত্মীয়তা লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠছে। 'The waves' নামক উপন্যাসে উল্‌ফ বর্ণের সাহায্যে মনস্তাত্ত্বিক আয়তন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন বলে অনেকেই মনে করেন। চিত্রপটে আলোছায়ার সূক্ষ্ম অভিবাদে যেভাবে অনুভূতির স্পন্দন আভাসিত হয়, ঐ উপন্যাসে ভার্জিনিয়াও যেন তাই করেছেন; তাই দেখা যায় বস্তুর দৃশ্যগত আয়োতন ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট হয়ে উঠেছে। উল্‌ফ্-এর প্রথম উপন্যাস 'The voice out'-ও তাঁর স্বতন্ত্র উপন্যাস-চিন্তার পরিচয় বহন করে; আমরা এর মধ্যেও চিত্রকলার সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধের আভাস পাই। এসম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য -

> "The achievement of the sense of the 'movement', of the instantaneous effect of a picture is clearly one of virginia Woolf's aims and to do this she has to break up the temporal sequence". ১১

বস্তুত চৈতন্য প্রবাহরীতির মধ্য দিয়ে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ সাহিত্য ও চিত্রকলা - এই দুটি শিল্পমাধ্যমের মধ্যবর্তী দূরত্বকে কমিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এবং এইজন্যই তিনি স্থানিক আয়তনকে দৃশ্যগ্রাহ্য করার জন্য চিত্রকলার উপযোগী উপকরণ ব্যবহার করতে চেয়েছেন। মিসেস্ ড্যালোওয়ে ছাড়াও 'নাইট এ্যান্ড ডে', 'ওরলেন্ডো', 'The years' প্রভৃতি রচনাতেও একই প্রবণতা লক্ষ করি। এখানে স্বয়ং উল্‌ফ-এর একটি মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক -

> "There is an astonishing number of things that never get into novels at all and yet are of the salf of life." ১২

নতুনরীতির উপন্যাসে বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্বয়ন যেহেতু বিশিষ্ট কৌশল হিসেবেই গণ্য, প্রাকরণিকপুনরাবৃত্তি অনিবার্যভাবেই দেখা দেয়। এ-সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য -

"Repetition is an essential strategy in composition; it guarantees similarity and forces the consciousness upon the nature of the thing seen while at the same time it provides the avenue along which movement and change may occur."[১৩]

বিষয়ভাবনা ও ভাষা-চেতনায় যে অনন্যতা নিয়ে এলো নতুনরীতির উপন্যাস, তা স্পষ্টতই মূল্যবোধের সার্বিক পালাবদলের দ্বারাই অনুপ্রাণিত অর্থাৎ মানবসত্তার ধারণাও তখন আমূল পাল্টে গিয়েছিলো। এর মানে হলো এই যে চেতনা-প্রবাহরীতির উপন্যাসে ব্যক্তি-অস্তিত্বের যে চিত্র উদ্ঘাটিত হলো, তা পুরোপুরি নতুন ও অনেকান্তিক জটিলতায় গ্রথিত। ভার্জিনিয়া উল্ফ, জেম্স্ জয়েস্, হেনরি জেম্স্ কিংবা মার্সেল প্রুস্ত - যে ঔপন্যাসিকের কথা আমরা বলি না কেন, এঁদের চরিত্রচিত্রনের অন্তর্বৃত নান্দনিক নীতি বা আখ্যান-বয়নের কৌশল : সমস্তই একটি যৌল আকল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তাঁদের উপন্যাসের বিষয়-ভাবনা, চরিত্রচিত্রণ, রচনাকৌশল সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনাই একটি অভিন্ন সত্যের দিকে তর্জনী সংকেত করে। এঁদের কাছে পুরোনো অর্থে ঘটনা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, চেতনার আলোড়নই অন্বিষ্ট অর্থাৎ ইমপ্রেশনবাদী চিত্রকলার মতো খন্ড খন্ড মুহূর্তের অনুভবগম্য উদ্ভাসনই রচনা-প্রয়াসের লক্ষ্য। এ বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য এরকম :

"If the character does not change, if its interior and exterior history has no important influence upon it, and it is the definition and description of types of character and the demonstration of these types that interest the writer, the problem is one of projecting character in time without a

sequence of events and all the context of irrelevant accidents. This leads naturally to repetition, the constantly new assertion and realisation of the same simple thing, an existence with its typical qualities, not an event." [১৪]

প্রতিষ্ঠানিক রচনা-ধারার বিরুদ্ধে চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রবক্তারা যে সার্বিক বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন তার অভিব্যক্তি আমরা উইলিয়াম ফোক্‌নার এবং মার্সেলপ্রুস্তের উপন্যাসেও লক্ষ করি। তবে মার্সেল প্রুস্তের 'হারানো সময়ের সন্ধানে' বা 'Remembrance of things past' নামক উপন্যাসকে অনেকেই উল্‌ফের উপন্যাসের পূর্বসূরী বলতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও আমরা শুধু বলতে পারি যে এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থাপিত সময়কে পুঙখানুপুঙখভাবে বিশ্লেষণ করে এবং স্মৃতির দর্পনে পরিশীলিত করে প্রুস্ত মানবসত্তার যে গভীর উদ্‌ঘাটন সম্ভব করে তুলেছেন - তার পথটিতেই আমরা চেতনাপ্রবাহরীতির আভাস ফুটে উঠেছে। এই বক্তব্য এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে সময়ের বিভিন্ন আয়তনকে ভেঙেচুরে আখ্যান-বয়নে মিশিয়ে দেওয়ার যে ঔপন্যাসিক রীতি প্রুস্ত তুলে ধরেছেন, কোনো কোনো সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস ত্রয়ীতে তারই প্রগাঢ় ছায়া লক্ষ করেছেন। কেননা খগেনবাবুর মধ্য দিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদও হারিয়ে-যাওয়া সময়েরই সন্ধান করেছেন। শুধু সন্ধানই করেননি, বর্তমান ও অতীতকে অভিন্ন অবতলে অন্বিত করে, জীবন সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনার বিকল্প সন্দর্ভই নির্মাণ করতে চেয়েছেন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করার আগে আমরা চৈতন্যপ্রবাহরীতির প্রধান প্রবক্তা অর্থাৎ জেম্‌স্ জয়েস ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ রচিত উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণলব্ধ একটি চমৎকার মন্তব্য স্মরণ করতে পারি। লক্ষ করব যে নিম্নোদ্ধৃত এই মন্তব্যটি প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য-প্রবাহরীতি সম্পর্কে উল্‌ফ্-প্রস্তাবিত [illegible] নব্যধারার ঔপন্যাসিকদের ইস্তাহার :

"Life is not a series of gig lamps symmetrically arranged; but a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to the end. Is it not the task of the novelist to convey this varying, this unknown and uncircumscribed spirit, whatever aberration or complexity it may display, with us little mixture of the alien and external possible ?" ১৪

এবার আমরা ধূর্জটিপ্রসাদের আখ্যান-বয়ন বিশ্লেষণের প্রতি মনোযোগী হতে পারি। ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসত্রয়ীর চরিত্রগুলি অর্থাৎ খগেনবাবু, খগেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রী দেবী, সাবিত্রীদেবীর বন্ধু রমলাদেবী, সুজন, বিজন ইত্যাদি মূলত মননজীবী, ঘটনা-পরম্পরায় এদের সংযোগ খুবই কম। বাইরের জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে এদের যতটুকু না সম্পর্ক, তার চেয়ে ঢের বেশি সম্পর্ক তাদের নিজ নিজ অন্তর্জগতের মানস-প্রবাহের সঙ্গে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র খগেনবাবু একজন বুদ্ধিজীবী, আপাত-দৃষ্টিতে তাঁর সত্তাকে আমরা নিষ্ক্রিয় হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। মনকে ঘিরেই তাঁর সক্রিয়তা বা সজীবতা। তাঁর মানসকূটের গুম্ফিলতা বাইরের কর্মক্ষেত্রে ব্যক্ত হয় না, মনোজগতেই তার আবর্তন ও বিস্তার। তাঁর সক্রিয়তা মনেই সীমাবদ্ধ। যেমন বুদ্‌বুদ্ জলে জন্ম নিয়ে জলেই মিলিয়ে যায়, তেমনি খগেনবাবুর অস্তিত্ব-নির্ণায়ক সক্রিয়তা মনে জাগে, মনেই বিলীন হয়ে যায়।

সাধারণ ভাবে আমরা জানি যে, ঘটনাপ্রবাহ উপন্যাসের কাঠামোকে সরল হয় না। কিন্তু কোনো উপন্যাসে যখন ঘটনার পরিবর্তে চরিত্রের প্রাধান্য সূচিত হয়, কেবল তখনই দেখা দেয় সরল কথাবস্তুর (প্লটের) প্রয়োজনীয়তা। উপন্যাস যখন চরিত্রের মনোজগতের

সত্য নিরূপন করতে আগ্রহী, কেবল তখনই গল্পের আকর্ষণ কমে যায় এবং কথাবস্তু ও জটিলতা প্রত্যাহার করে নেয়। বাংলা উপন্যাসে কবে থেকে এই পর্বের সূচনা হয়েছে তা বলা কঠিন। তবে অনেকেই মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে উপন্যাসের বিষয়-বস্তু পরিবর্তনের ছবি চোখে পড়ে। 'নবপর্যায়ের পদ্ধতির' ধারক 'চোখের বালি'তে দেখা যায় যে এর আয়তন দীর্ঘ, কাহিনী-অংশও জটিল, কিন্তু কথাবস্তু-নির্মাণ সরল ও রৈখিক। মনস্তত্ত্ব-মূলক উপন্যাসে এই জাতীয় সরল কথাবস্তু সহজেই চোখে পড়ে। ধূর্জটি-প্রসাদের আলোচ্য ত্রয়ী উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে স্পষ্টতই নতুনত্ব রয়েছে। প্রচলিত ধারাকে এখানে অনুসরণ করা হয় নি। লেখক উপন্যাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়েছেন :

> "একজন তথাকথিত ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বাস্তবজগৎ ও ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই হল খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া কিন্তু পলায়ন অসম্ভব। নিজের অজ্ঞাতে খগেনবাবুর রমলাদেবীর প্রতি আকর্ষণ হ'ল অন্তঃশীলার বিষয়। খগেনবাবুর ক্রমবিকাশ এখানেই শেষ হয়নি। আবর্ত ও মোহানায় সেই ধারা চলেছে।" [১৬]

ভূমিকাংশে লেখকের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়, যখন দেখি যে এতে কোনো গল্পাংশ নেই। আছে নায়কের চিন্তাস্রোতের ক্রমানুসারী উপস্থাপনা। খগেনবাবু এই ধারার উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন -

> "সত্যকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়ত কোন সিদ্ধান্তই থাকবে না। কীটসের Negative capability থাকবে, তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে। একটা ঘটনা ঘটুক। অমনি খড়কুটো যেমন স্রোতে ভেসে যায়, ঘটনাটি তেমনি বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে।
> ... জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, অতি সাধারণ তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, কখনও আসে জোয়ার, কখনও ভাঁটা, কখনও

বা বান ডাকে, বন্যা আসে, চোখ খুলে দেখলে সেই স্রোতে কত ঘূর্ণি, কোথাও বা আবর্ত,এইত জীবন! মোহানা কোথায় ? ... কিন্তু প্রধান কথা স্রোত চলছে - কুলকুল তার ধ্বনি, কুলকুল করে কোথায় ভেসে যাচ্ছে কে জানে ?"[১৭]

উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝবার জন্য উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি বিশেষ মূল্যবান। মানুষের জীবন-স্রোত প্রবাহিত হয়েই চলেছে। এই স্রোত থামবার নয়, এই স্রোতের টানে অনেক আদর্শবাদী মানুষের পতন হয়, পূর্বনির্ধারিত ছক ওলটপালট হয়ে যায়।

ত্রয়ী উপন্যাসে আমরা নায়ক খগেনবাবুর চিন্তাস্রোতের আধিক্য দেখতে পাই। খগেনবাবুর জীবনের নানা ঘটনার বিচিত্র দিকগুলি উপন্যাস ত্রয়ীতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অন্তঃশীলা'র প্রথমেই খগেনবাবুর স্ত্রীর আত্মহত্যার কথা বলা হয়েছে। করোনার সাহেবের গম্ভীর কণ্ঠে রায় দান -

"সাবিত্রী দেবী, খগেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী, ক্ষণিক উন্মাদনার বশে আত্মহত্যা করেছেন।"[১৮]

এরপর থেকেই উপন্যাসের শুরু। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে খগেনবাবুর চিন্তাশক্তি গতিময় হয়ে উঠলো। তিনি আত্মবিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন -

"সাবিত্রীর স্বভাবই ছিল তাই, সন্দেহ আর সন্দেহ।"[১৯]

এই সন্দেহের জন্যই রমলাদেবীর সঙ্গে স্বামী খগেনবাবুর সম্পর্ক গড়ার একটা কল্পনা তাঁকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিলো। অবশ্য পরবর্তী কালে সাবিত্রীর এই সন্দেহ বাস্তবায়িত হয়ে উঠে। লেখক জানান যে খগেনবাবুর,

"একাকিত্ববোধ আবার জেগে উঠল সংসারের কাঁটার খোঁচায় ! তার একাকী, নিরালম্ব হবার সাধনাই বইখানির একটি বিষয়।"[২০]

এই একাকিত্ববোধ বোঝাবার জন্য সজারুর উপমা গ্রহণ করা হয়েছে -

"মানুষ হল একলা, সজারুর মত সে থাকে গর্তের মধ্যে; গর্তের মুখে কত পাতা কত কুটো দিয়ে সে নানা রকমের বাধা সৃষ্টি করছে, শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে। গর্তের মধ্যে সজারু থাকে শঙ্কিত চিত্তে, বাইরের হাওয়া প্রবেশ করল, ভেতরে সে ভয়ে কাঁপতে লাগল, ঐ বুঝি এলো। এক নিঝুম গোধূলিতে সে বেরিয়ে পড়ল খাদ্যের অনুসন্ধানে, বাইরে এসে তার পা আর চলে না, গর্তের মুখের কাছে এসে আর এগোতে চায় না, ছুটো-ছুটি করে, কোথা থেকে ঝমর্ ঝমর্ শব্দ আসছে। আবার ভিতরে ছুটে যাওয়া, আবার - আবার ভয়ে বাইরে আসা, ক্ষুধার তাড়নায়।" [২১]

মানুষের মধ্যে প্রায়শই এই দ্বৈত সত্তা কাজ করে। এটিই প্রকৃতির নিয়ম, তাইতো উপন্যাস ত্রয়ীতে দেখা যায়, নায়ক খগেনবাবু একবার বেরিয়ে আসছেন জৈবিক ক্ষুধার তাড়নায় আবার নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইছেন। কিন্তু সারাটা জীবন ধরে চেষ্টা করেও যথার্থ একাকী থাকতে পারেননি।

"এই অক্ষমতাই হলো লোকটির ট্র্যাজেডি।"[২২]

- এই মন্তব্য ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর। তিনি সজারুর উপমাটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। অন্যদিকে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও এই অভিযোগের সঠিক উত্তর দেন নি। "উপমার সার্থকতা খগেনের উত্তেজিত মেজাজে" [২৩] এই কথা বলে পাশ কাটিয়ে গেছেন। তবে সমালোচক গিরিজাপতি ভট্টাচার্য বলেছেন -

"খগেনবাবু চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন ও সেই জন্যেই তাঁর নিষ্ক্রমণ - escape। এ নিষ্ক্রমণ শুধু সমাজ বা রমলার মিলন লাভের সম্ভাবনা থেকে নয়, এ নিষ্ক্রমণ বুদ্ধি ও বিচারের কারাগার থেকে।" [২৪]

স্বভাবতই আমরা সজারুর গর্তকে বুদ্ধি ও বিচারের কারাগার বলে ধরে নিতে পারি। বুদ্ধির বন্ধন থেকে মুক্তি না পেলে আধুনিক বুদ্ধিজীবীর জীবন স্বাভাবিক হয় না, খগেনবাবুর মন্তব্যে আমাদের তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কেননা খগেনবাবু শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান বা সাংখ্য-বেদান্ত কোনো কিছুর মধ্যেই মুক্তির সন্ধান পান নি। ফলে আমরা দেখতে পেলাম যে 'অন্তঃশীলা'র মূল বিষয় কিন্তু প্রেম বা প্রেমজনিত দহনও নয়। কেবল-মাত্র 'অন্তঃশীলা' নয়, 'আবর্ত' ও 'মোহানা'-তেও আধুনিক মানুষের অস্তিত্বগত সংকট ও পথ-সন্ধানের ব্যাকুলতা প্রতিফলিত হয়েছে। একজন বুদ্ধিজীবীর আত্মবিশ্লেষণের চেতনা-শীলিত চিত্র তুলে ধরে ধূর্জটিপ্রসাদ বাংলা উপন্যাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। ধূর্জটি-প্রসাদ ত্রয়ী উপন্যাসে স্মৃতিও অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে পাত্র-পাত্রীদের আত্মিক সংবেদনার ছবি উপস্থাপিত করেছেন। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেও এধরনের প্রায়োগিক প্রকরণের (যেমন : interior monologue) ব্যবহার করা হয়েছে। উপন্যাস ত্রয়ীতেও প্রচলিত অর্থে চরিত্রায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। খগেনবাবুর অনুভব ও আবেগকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। মনোজগতের গ্রন্থিলতা উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়েই উপন্যাস ত্রয়ী গতানুগতিক উপন্যাস থেকে আলাদা হয়ে গেছে, অভ্যস্ত ধরনের কথাবস্তু[41] প্লটের ভূমিকা এখানে গৌণ। যদিও এখানে একটি কাহিনীবৃত্তের রূপরেখা খুঁজে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু তা কোনো ভাবেই চরিত্র-প্রধান উপন্যাসের কাহিনী গ্রন্থনার সঙ্গে তুলনীয় নয়।

আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে সক্রিয়তার চেয়ে চিন্তাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও বিশ্লেষণের প্রতি লেখক একাগ্র। এধরনের উপন্যাসে ক্রমানুসারী সময়কে চিত্রিত করা সম্ভব হয় না। কারণ মনের চলাচল এতই ক্ষিপ্র ও জটিল যে তাকে ঐ অভ্যস্ত কালক্রমে সর্বদা ধরা যায় না। মনে অতীত ও বর্তমান একাকার হয়ে যায়। আর মনের মধ্যে কালক্রম যেহেতু সুশৃঙ্খল নয়, সেইজন্যে মনের গতি-প্রকৃতি অনুসরণে যে উপন্যাস রচিত হয়, স্বাভাবিক ভাবে তার রীতি-পদ্ধতি

সরল হয় না। তাছাড়া তা সময়-শৃঙ্খলকে মানে না বলেই জটিল হবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বোধ্যও হয়ে উঠে। মনের চিত্র তুলে ধরেন বলেই এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকগণ পূর্বসূরী ঔপন্যাসিকদের মতো সর্বজ্ঞ সর্বদর্শীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন না। বরং লেখক নতুন রীতির উপন্যাসে চিত্রিত পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। লেখক-ব্যক্তিত্বের ছায়া প্রায় সর্বত্রই অনুভূত হয়। ঔপন্যাসিক সংবিৎ স্রোতের মধ্য দিয়ে সরাসরি পাত্র-পাত্রীর মনের অন্দরমহলে নিয়ে যান পাঠককে, যেখানে চিন্তা-ভাবনার দ্বারা প্রকাশিত হয় তাদের কাজ, আচরণ, বিশ্বাস ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য। সেজন্যই এই ধরণের উপন্যাসে জোড়ালো কথাবস্তু বা প্লট থাকে না। লেখক অন্তরালে থাকেন বলেই, এখানে পাত্রপাত্রীর স্মৃতির সাহায্য প্রয়োজন, সেই সঙ্গে বিবিধ অনুষঙ্গেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সাধারণ ভাবে স্মৃতি অতীত-রোমন্থনের ধারাবাহিক ক্রিয়া-বলে মনে হলেও এই উপন্যাসগুলিতে তার ব্যবহার অনুষঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেননা এখানে মনের চলাচল অনুসরণের জন্য ধারাবাহিকতার গতি বজায় থাকে না, স্মৃতিতে কারণে-অকারণে নানা সময়ের নানা ঘটনা তালগোল পাকায় ঐ অনুষঙ্গের লয়-বিলয়ে। হয়তো বা এই কারণেই আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস মূলত আত্মজৈবনিক হয়ে ওঠে। কিন্তু তা লেখকের আত্মজীবনী নয়। প্রুস্ত, জয়েস, উলফ্ প্রমুখ লেখকদের উপন্যাসে এই প্রবণতা আমরা লক্ষ করি।

যেকোনো সৃষ্টির মূলে লেখকের বিশেষ একটা উদ্দেশ্য থাকে। ধূর্জটিপ্রসাদের লেখার মধ্যেও একটা মৌলিকত্ব পাওয়া যাবে, এটি না বললেও বোঝা যায়, কেননা তিনি একজন আত্মসচেতন বুদ্ধিজীবী। 'ঝিলিমিলি'-তে তিনি লিখেছেন -

> "এইটা নিয়ে উনিশ খানা বই লিখলাম ... কী লিখেছি তাই জানিনা। তবে বোধ হয় একটা মোটা ধারা আছে। তাকে Personality বলা চলে - নভেলে তাই, সমাজতত্ত্বে তাই, অর্থনীতিতে তাই, ইতিহাসেও তাই, সঙ্গীতেও তাই। এর আশেপাশে

কার্লমার্কস। আমার জীবনে মার্কসিজম্-এর প্রভাব বেশি। ... সমাজতত্ত্বে ইতিহাসে মার্কসিজম্ চলে, তাই এখনও লিখি। আমার নভেলেও তাই আছে। নিজেকে marxologist বলা চলে। ভারতবর্ষে সে বস্তু বিরল, তাই আমিও বিরল।" [২৫]

মার্কসবাদের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েই ধূর্জটিপ্রসাদ উপন্যাসে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ইন্দিরা দেবীর 'অন্তঃশীলা' বিচারের উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থন করে 'বয়ান-ই-তহারিরি'-তে লিখেছেন -

"হ্যাঁ, ইখানিতে সমাজ সমালোচনা আছে - বিশেষতঃ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের।" [২৬]

লেখক নিরেট মধ্যবিত্ত সমাজকে তুলে ধরেছেন, উপস্থাপিত করেছেন তাদের সুবিরোধিতা ও নিঃসঙ্গতা আর স্ত্রী-পুরুষের অসমতা, রাজনৈতিক জগতে অসন্তোষ, মধ্যবিত্ত সমাজের ভণ্ডামি। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বাইরের জৌলুষ নিয়ে ব্যস্ত। খগেনবাবু এ-সমাজের একজন হয়েও বিচ্ছিন্ন। নিঃসঙ্গ খগেনবাবুর উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী-অবস্থান থেকে সচেতন ভাবে সরে যাওয়ার কাহিনী হলো 'অন্তঃশীলা'। মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থানে খগেনবাবু একটানা তাত্ত্বিক প্রতিবাদ চালিয়ে গেছেন। যত বেশি করে তিনি তত্ত্ব নিয়ে এই সমাজের বিশ্লেষণ করেছেন ঠিক তেমনি তাড়াতাড়ি এই সমাজের একজন হয়ে ওঠার ক্লান্তিকর চেষ্টা করেছেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী তাঁর এই প্রক্রিয়ার সমালোচনা করে বলেছেন -

"লেখকের পান্ডিত্য আছে, সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, রসবোধ আছে, - ভূয়ো - দর্শন ভূয়োপঠন ও ভূয়োচিন্তন আছে। মালমসলা সবই আছে, তবে ইমারত গড়েছেন কিনা, ... সে বিষয়ে আমি নীরব, কারণ বুঝতে অক্ষম।" [২৭]

এর উত্তরে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন -

"খগেন চরিত্র হিসেবে কেবল impossible নয়, futile." [২৮]

'অন্তঃশীলা'র আলোচনায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জানান -

"তাঁর কর্তব্য সুসমঞ্জস পাত্রপাত্রীর বিবর্তনের ছবি আঁকা" [২৯]

আর, বিষ্ণু দে 'আবর্তে'র পুস্তক পরিচয়ে লিখেছেন -

" পাত্রপাত্রী -চরিত্র উপন্যাসে আসলে একটা সুসমঞ্জস বা ইমার্জেন্ট ব্যাপার। লেখকের পুরুষার্থ বা তাৎপর্যার্থের আবশ্যিকতায় যে ছন্দ সমগ্র রচনার অস্থি-মজ্জায় ছড়িয়ে পড়ে, সেই ছন্দের নির্দেশে, ভাষা ব্যবহারে, প্লটরীতিতে, গল্পের বিকাশেই পাত্রপাত্রীর আর্বিভাব।" [৩০]

অন্যদিকে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন -

"এই উপন্যাস তিনটিতে সমগ্রতা-সন্ধানী (কেননা সমগ্রতাই সার্থকতা) আধুনিক মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধিজনিত যন্ত্রণারই প্রতিফলন ঘটেছে।" [৩১]

কোনো সন্দেহ নেই, এসব সম্ভব হয়েছে চৈতন্যপ্রবাহরীতির সার্থক প্রয়োগের ফলে। যেকোনো লেখার পেছনে ধূর্জটিপ্রসাদ যে তত্ত্ব প্রচার করতে চান, তাহলো - 'ব্যক্তি থেকে পুরুষে' উত্তরণ। এটি অবশ্য প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তেমন বিপত্তি ঘটায় না তবে উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত করে কিনা - তা বিবেচ্য। ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধূর্জটিপ্রসাদ বীরবলের মতোই বুদ্ধিবাদের প্রবক্তা এবং তীক্ষ্ণ সরস বাক্য ব্যবহারে আগ্রহী। তিনি নিজেকে বীরবলের 'অযোগ্যশিষ্য' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি যে বীরবলের সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'মনোবিজ্ঞান' গল্পের নায়ক চরিত্র যখন শানিত বাক্যে বীরবলী ভাষাকেই আক্রমণ করে -

"যেমন বিদ্যাসাগরী ভাষায় লেখাও যায় না, কথা কওয়াও যায় না, তেমনই বীরবলী ভাষায় লেখা তো যায়ই না, কথা কওয়াও যায় না।" [৩২]

এ-রকম গুরু-মারা-বিদ্যা তিনি গুরুর কাছ থেকেই শিখেছিলেন। অবশ্য সবক্ষেত্রে তিনি বীরবলী ভাষাকে বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। 'অন্তঃশীলা'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন -

> "বীরবলী ভাষা এতই সচেতন যে তার সাহায্যে খগেনবাবুর মনের নিম্ন চেতন অংশের খবর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন।" ৩৩

কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ কি সত্যিই বীরবলী ভাষাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন ? তা মনে হয় না, কেননা তাঁর রচনাতেই রয়েছে -

> "প্রমথ চৌধুরীর মতোই ঋজু নির্মোহ নিরাসক্ত দৃষ্টির সাধনা।" ৩৪

'এই'ঋজু নির্মোহ নিরাসক্তি -কে প্রকাশ করতে গেলে বীরবলী প্রভাব এড়ানো সম্ভব নয়। তাই জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক ধূর্জটিপ্রসাদের রচনায় বীরবলী প্রকরণ লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে 'এপিগ্রাম'গুলি আলোচনা করলে বোঝা মুশকিল হয়ে যায় যে এগুলি কার, বীরবলের না ধূর্জটিপ্রসাদের লেখা। যেমন -

(ক) "স্বামীকে খুব ভালো না বাসলে স্ত্রী আত্মহত্যা করে না।" ৩৫

(খ) "ভিড় আর স্ত্রীলোক একই বস্তু, দুটোই স্বাতন্ত্র্য-বিরোধী।" ৩৬

সুতরাং উপরিউক্ত উদাহরণগুলি প্রমাণ করে যে, ধূর্জটিপ্রসাদ বীরবলের ভাষা পরিহার করতে পারেননি। শুধুমাত্র এপিগ্রাম রচনায় নয়, যখন তিনি মানুষের মনের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন তখন থেকেই

> "তাঁর ভাষা ভঙ্গিমার বীরবলী প্রকরণ প্রথম থেকেই কেমন আস্তে আস্তে একটা সহৃদয় অন্তরঙ্গতায় সুন্দর হয়ে উঠেছিল।" ৩৭

উপন্যাস-ত্রয়ীতে বিষয়বস্তুর মধ্যেই এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাতে ভাষাকে 'সহৃদয় অন্তরঙ্গতায় সুন্দর' হয়ে উঠতেই হয়।

এছাড়া ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসে সংগীত-শিল্পের অন্তঃশীল প্রবাহ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসে সংগীতের প্রসঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রে টমাস মানের কথা

আমাদের মনে আসে। মান তাঁর একটি বিখ্যাত উপন্যাসে জানিয়েছেন :

"Music and narration are alike, in that they can only present themselves as a flowing, as a successions in time, as one thing after another and both differ from the plastic arts, which are complete in the present, and unrelated in time...." ৩৮

মানের গল্প-উপন্যাসে একইভাবে সংগীত একাত্ম হয়ে আসে। সংগীতের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শিল্পকলা, শিল্পকলার সঙ্গে কবিতা, কবিতার সঙ্গে সৌন্দর্যতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্বের সঙ্গে কখনো বা চিকিৎসাশাস্ত্র। আসলে মান শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার বা উপন্যাসিকদের ধর্মপালন করে গেছেন, তাঁর রচনায় জীবনের অথবা সময়ের সমস্ত কিছুর সঙ্গে বোধ-বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থাৎ সমগ্রমানব সমাজের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপনের মাধ্যমে। মানের দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে হলে প্রাচীন গ্রীকদের মতো সৃজনী সংস্কৃতির মানকে এমন উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে যাতে শাদা-মাটা বাস্তবের অবয়ব রূপান্তর লাভ করে। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের দ্বন্দ্বে যা পুরোপুরি ব্যক্ত হয় না - সেই সব আখ্যান-সংকেত সংগীত ও চিত্রকলার মতো অন্য শিল্পমাধ্যমের সঞ্জীবনী স্পর্শে পুষ্পিত হয়ে ওঠে। মানের মতো হেনরি জেম্‌স, উল্‌ফ বা প্রুস্তের উপন্যাসে সাংগীতিক গঠনের ছায়া পড়েছে। মার্সেল প্রুস্ত নিজেই একটি চিঠিতে লিখেছেন -

"I too compose symphonies in my own way".৩৯

তেমনি জেমস জয়েসের ulysses উপন্যাসেও অনেকে প্রতীচ্যের ধ্রুপদী সংগীত শৈলীর (যেমন সোনাটা, সিম্‌ফনি, ফুগ্‌ ইত্যাদি) অনুসৃতি লক্ষ করেছেন। তাছাড়া আন্দ্রে জিদের ছঁ সিমফনিজ বা ওলড্‌ুয়াস হাক্‌সলির পয়েন্ট কাউন্টারপয়েন্ট উপন্যাসের মধ্যে স্পষ্টতই

সাংগীতিক কাঠামোর ছায়া পড়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর উপন্যাস ত্রয়ীতে সময়ের গতির সঙ্গে সংগীতের লয় মিলিয়ে দিয়েছেন। এ-সম্পর্কে যা তিনি ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর বক্তব্যের জবাবে লিখেছেন-

> "অন্তঃশীলার আঙ্গিক সঙ্গীতের, যন্ত্রসঙ্গীতের। বিদেশী সঙ্গীতে বিশেষতঃ fugue-এর, যাতে subject, একাধিক counter-subject থাকে, একটি অন্যটির জবাব, মাঝে মাঝে ঝগড়া, গড়ে তৈরী হচ্ছে রূপ নয় style, ... সাহিত্যে verticle কিম্বা block harmony চলে না - চলে horizontal harmony, যেটা উপভোগ করা বাঙালীর পক্ষে শক্ত নয়, ভাবতায়। ... অন্তঃশীলার টেক্‌নিক উপভোগ পাঠকপাঠিকার চিন্তাশীলতার চেয়ে স্মৃতিশক্তি-রই প্রয়োজন বেশি। সঙ্গীত যেমন melody অন্তঃশীলার তেমনি মেজাজ।" [৪০]

ধূর্জটিপ্রসাদ সঙ্গীতের তন্নিষ্ঠ সাধক ছিলেন তা আমরা জানি। 'সুর ও সংগতি' বইতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গানের নানা আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়া অতুলপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিলো। তবে তিনি ধ্রুপদের নীচে কখনোই নামেননি। আরো দেখা যায় যে তাঁর উপন্যাসে সুগতোক্তি-র সূত্রে এসে যায় বিশ্বসাহিত্য বা বিশ্বশিল্পের নানান সমাচার, স্বদেশের নানা মনীষীদের প্রসঙ্গ। যেমন রঁদা, মোপাসাঁ, দান্তে, মনতেস্কিউ, স্কারোঁ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, বালজাক, ফ্লবেয়ার, উদয়শঙ্কর, শার্লক হোমস, ... প্রমুখ। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষাশৈলী সম্পর্কে লিখেছেন -

> "নিপুণ সংলাপ হল তাঁর লেখার ঢং। তিনি নিজেই লিখেছেন, কোনও কাল্পনিক প্রতিপক্ষকে খাড়া করে তীক্ষ্ণ তির্যক্ ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের ভঙ্গীতে লেখাই তাঁর পছন্দ।" [৪১]

তবে এই সবই সার্থক হয়ে উঠেছে চেতনাপ্রবাহরীতির নিপুণ প্রয়োগে, এই সূত্রেই ঘটেছে আঙ্গিকতার বিভিন্ন উপকরণের চমৎকার উদ্ভাসন।

সবশেষে আমরা বলতে পারি যে চেতনাপ্রবাহরীতিতে ত্রয়ী উপন্যাস রচনা করে ধূর্জটিপ্রসাদ আসলে বাংলা উপন্যাসের গন্ডীবদ্ধতাকে অস্বীকার করে আন্তর্জাতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজের সৃজনীভাবনাকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছেন। ঔপনিবেশিক সমাজে সময় যখন স্থবিরায়িত, সে-সময় তিনি সময়-প্রবাহের অন্তর্লীন স্পন্দনকে উপন্যাসের শিল্পসত্তার সঙ্গে অন্বিত করতে চেয়েছেন। ধূর্জটিপ্রসাদের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এখানেই যে বৌদ্ধিকতার স্তরে তিনি ঔপনিবেশিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন এবং এভাবেই দ্বন্দ্ব-মথিত মানবসত্তার অবিরল আত্ম-পরিক্রমার গভীর তাৎপর্য উদ্ঘাটন করেছেন। প্রতীচ্যের এক বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন -

> "The Novel is, in fact, a-hymn to the fertility and variety of human awareness. The sun is life, and it shines on the sea of time: So there are incessant changes, countless effects of shimmer and illusion".[৪২]

উল্লেখপঞ্জী :

১। দ্রষ্টব্য : জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রমথ চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৬(১৯৫৪), পৃ.১২৪

২। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়: ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী (১ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ.১৩

৩। দ্রষ্টব্য : শিশির চট্টোপাধ্যায়, উপন্যাস পাঠের ভূমিকা, বুকল্যান্ড, কলকাতা, ১৯৬২, (১৯৬২) পৃ.২৩

৪। William James : Principles of Psychology, New York, Dover Publi, - 1890, p.224.

৫। Richardson, Samuel: Clarissa; On the History of a young Lady; into by John Butt, London, J.M. Dent. & Sons, 1962, Preface.

৬। Anthony Burgess; JOYSPRICK, an intraduction to the languages to James, Joyee, London, Andra Deutsch.Ltd., 1971, p.48.

৭। James Joyee; Ulysses, Ramdom House, New York, 1961, p.194.

৮। Richard Ellmann; The consciousness of Joyce, London, Faber & Faber, 1977, p.5.

৯। প্রাগুক্ত, JOYS PRICK, p.177.

১০। Allen Mc Laurin; Virginia woolf, The Echoes Enslaved, London, Cambridge Univ. Press, 1973, p.108.

১১। তদেব, পৃ.৮৬

১২। দ্রষ্টব্য : তদেব, পৃ.৮৭

১৩। তদেব, পৃ.১১

১৪। তদেব, পৃ.১০০

১৫। PAUL West; The Modern novel, Vol.I, London, Hut-Chinson University Library, 1963, p.35.

১৬। প্রাগুক্ত, গ্রন্থপরিচয়, পৃ.২৪০

১৭। তদেব, 'অন্তঃশীলা' পৃ.১২

১৮। তদেব, পৃ.১

১৯। তদেব, পৃ.২

২০। তদেব, 'বয়ান-ই-তহরিরি,' পৃ.২৩৫

২১। তদেব, 'অন্তঃশীলা', পৃ. ৭-৮

২২। প্রাগুক্ত, 'বয়ান-ই-তহরিরি', পৃ.২৩৫

২৩। তদেব, পৃ.২৩৫

২৪। তদেব, 'পরিশিষ্ট', পৃ.২৪৫

২৫। তদেব, (তৃতীয় খন্ড), 'ঝিলিমিলি', পৃ.২১৭-১৮

২৬। তদেব, (১ম খন্ড) 'বয়ান-ই-তহরিরি', পৃ.২৩৮

২৭। তদেব, 'অন্তঃশীলা'র বিচার, পৃ.২৩৩

২৮। প্রাগুক্ত, 'বয়ান-ই-তহরিরি' পৃ.২৩৮

২৯। তদেব, পরিশিষ্ট, পৃ.২৫২

৩০। তদেব, পৃ.২৫১

৩১। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ.৩৩২

৩২। প্রাগুক্ত, (১ম খন্ড), 'মনোবিজ্ঞান' - পৃ.২১৩

৩৩। তদেব, পরিশিষ্ট, পৃ.২৪১

৩৪। তদেব, ভূমিকা, পৃ.দশ

৩৫। তদেব, 'অন্তঃশীলা' - পৃ.৫২

৩৬। তদেব, পৃ.১৮

৩৭। তদেব, ভূমিকা, পৃ.এগার

৩৮। H.T.Lower Porter (Ed.); The Magic Mountain Vol.II, Penguin, London, 1927, p.683.

৩৯। Mina Curtis ed.; Letters of Marcel Proust, Vintage Book, 1966.

৪০। প্রাগুক্ত, 'বয়ান-ই-তহরিরি' পৃ.২৩৬-৩৭

৪১। দ্রষ্টব্য : জলার্ক, ধূর্জটিপ্রসাদ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ.২০৩

৪২। প্রাগুক্ত, 'The Modern Novel', পৃ.৩৩